এশিয়ায় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আদিত্যবর্মনের পঞ্চাশ বছর আগে সুমাত্রার উত্তর-পূর্বে পাসাই রাজ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এর প্রথম শাসক মালিক-এল-শালি ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। পঞ্চদশ শতকে পূর্ব সুমাত্রার বন্দরগুলিতে সুলতানি রাজ্য স্থাপিত হয়।

৪.৫ ইসলামের আগমন

মহাদেশীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থেরাবাদী বৌদ্ধধর্মের মতো দ্বীপময় অঞ্চলে ইসলাম ছিল প্রধান ধর্মমত। ব্যতিক্রম শুধু ফিলিপিনস। এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন হয় অনেক দেরিতে, এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠার প্রায় ছ'শো বছর পরে। দ্বীপময় অঞ্চলে প্রথম মুসলিম রাজ্য হল পাসাই, আকের (Acheh) উত্তর উপকূলে। ঘটনাটি ঘটে ত্রয়োদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে। প্রায় একই সময়ে পূর্ব জাভাতে অনেকগুলি স্মৃতিসৌধ পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে ইসলামের অগ্রগতি ছিল মন্থর, ধীর। একটি কারণ হল এই অঞ্চলে ছিল প্রবল হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উপস্থিতি। অনেকগুলি হিন্দু-বৌদ্ধ রাজ্য ছিল। এসব রাজ্যের পতন ঘটে পঞ্চদশ শতকে, তারপর থেকে ইসলাম দ্রুত গতিতে বিস্তারলাভ করে। এই অঞ্চলে মেলকার (মালাক্কা) রাজা প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এর ফলে ইসলামের বিস্তারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে মেলকা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান থেকেই ইসলাম অন্যান্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেসব অঞ্চলের সঙ্গে মেলকার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সেগুলিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল। এই অঞ্চলের মুসলিম রাজ্যগুলিকে সুলতানাত বলা হত। এগুলি হল ইসলামের প্রধান কেন্দ্র। এসব কেন্দ্র থেকে ইসলাম প্রচারিত হয়। পঞ্চদশ শতকে ইসলাম বিস্তার লাভ করে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে—পেরাক, কেদা, পাহাঙ, কেলানতন ও ত্রেঙ্গানুতে। এসব স্থানে চতুর্দশ শতকের শেষে ইসলামি আইন-কানুন প্রবর্তিত হয়। দক্ষিণ থাইল্যান্ডের পত্তনি রাজ্যেও ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠা পায়। সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে একই ধারার পরিবর্তন ঘটে যায়। এখানকার নদী বন্দরগুলি ইসলামকে স্বাগত জানিয়েছিল। সিয়াক ও কাম্পার হল এর নিদর্শন। এসব মুসলিম রাষ্ট্র প্রণালী অঞ্চলে মালাক্কার (মেলকা) আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল প্রণালী অধিকার করলে মেলকার আধিপত্যের অবসান ঘটে।

জাভাতে, প্রাচীন মাজাপাহিতের কাছে, অনেকগুলি মুসলিম সমাধিসৌধ পাওয়া গেছে। স্থানটি সুরবায়ার ৬৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এগুলির নির্মাণকাল ত্রয়োদশ শতক। চতুর্দশ শতকের কয়েকটি সমাধি লেখ পাওয়া গেছে। জাভার এই সমাধিগুলিকে বলে মেসান, এতে রয়েছে শকাব্দের তারিখ (৭৮ খ্রিস্টাব্দ), ব্যবহার

করা হয়েছে প্রাচীন জাভা লিপি এবং লেখগুলিতে প্রচুর ফুল আঁকা হয়েছে। লেখর পেছনদিকে আরবি অক্ষরে কোরান থেকে উদ্ধৃতি আছে, অন্য ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল মৃত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। মাজাপাহিতের কাছে প্রাপ্ত এই সমাধিগুলির অন্য তাৎপর্য হল মৃত ব্যক্তিরা সম্ভবত রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাধির আকৃতি, সজ্জা, পুরোনো জাভা লিপি ও সংখ্যার ব্যবহার থেকে অনুমান করা হয় এরা বিদেশি নয়, ইন্দোনেশিয়ার লোক। এথেকে অনুমান করা যায় এসব মুসলিম মাজাপাহিতের গৌরবের যুগে ছিল রাজকর্মচারী অথবা অভিজাত ব্যক্তি। এদের সংখ্যা খুব কম ছিল না।

দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কারা ইসলাম প্রচার করেছিল তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেননি। এনিয়ে বিভিন্ন ধরনের মত ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। কোনো মুসলিম ধর্ম প্রচারক এখানে ধর্মপ্রচার করেননি। ভারতে সুলতানি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে তার প্রভাব পড়েছিল। আরব ও গুজরাটি বণিকরা এ অঞ্চলের সঙ্গে বহুকাল ধরে বাণিজ্য করত। বণিক ও নাবিকরা সম্ভবত ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। সুফি বণিকরা এখানে বাণিজ্যের জন্য এসেছিল, তাদের সংঘও ছিল। এরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হতে পারেন। আসলে দ্বীপময় রাজ্যগুলির রাজতন্ত্র ও অভিজাতরা ইসলামের একেশ্বরবাদী আদর্শ ও সমতার নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এখানকার মানুষের ওপর ইসলাম ধর্ম চাপানো হয়নি, এখানকার অভিজাত ও রাজতন্ত্র একসময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজেদের স্বার্থে গ্রহণ করেছিল। ঠিক তেমনই রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল ইসলাম হল নতুন শক্তির উৎস। বুদ্ধিজীবীরা এর বিস্তারে সহায়ক হয়।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত মালয় অ্যানালসে বলা হয়েছে জাভার ইসলামিকরণের কাজে প্রধান ভূমিকা ছিল চিনা মুসলিমদের। এই গ্রন্থ প্রামাণ্য নয়, তবুও অস্বীকার করা যায় না এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে চিনের প্রভাব ছিল। চিনা মহানাবিক চেং হো'র একজন সহকারী ছিলেন চিনা মুসলিম মা-হুয়ান যিনি ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাভায় ছিলেন।[১] তাঁর উপস্থিতির ফলে জাভাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়। তবে উল্লেখ্য মা-হুয়ানের আগমনের আগে জাভাতে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। জাভার ঐতিহ্যে বলা হয়েছে নয়জন ওয়ালি বা প্রচারক এখানে ইসলাম প্রচার করেন। এই ন'জনের একজন অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত্র। সুরবায়ার কাছে এই মালিক ইব্রাহিমের সমাধি রয়েছে, তারিখ ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দ।

১. চিনা মহানাবিক চেং হো নিজে মুসলিম ছিলেন।

সমাধিগাত্রের লেখ থেকে জানা যায় এই মালিক ইব্রাহিম ছিলেন গুজরাটের বণিক, তাঁর জন্মস্থান পারস্য। তবে তিনি যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই। এর পাশে গিরি হয়ে উঠেছিল একটি ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্র। এর রাজা হলেন একাধারে রাজা ও ধর্মগুরু। ধর্ম ও রাজনীতির ওপর এই রাজবংশের গভীর প্রভাব পড়েছিল, জাভা ও মালুকু অঞ্চলে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এদের প্রভাব ছিল। জাভার ঐতিহ্যে ওয়ালি এক রহস্যময় ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত। এরা সম্ভবত জাভার ডেমাকে প্রাচীনতম মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষোড়শ শতকের গোড়ায় এটি নির্মিত হয়।

এই মসজিদটি ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ। ইসলামি আঙ্গিককে স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলানো হয়। ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের মসজিদের সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। বর্গক্ষেত্রে অবস্থিত এই মসজিদে রয়েছে পাঁচতলা, রয়েছে বারান্দা ও সুসজ্জিত প্রবেশ পথ। বর্গক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে রয়েছে এই মসজিদ, জাভার সব শহরে এই ধরনের মসজিদ রয়েছে। মসজিদের গায়ে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা, ফুল ও প্রাণী। ডেমাক ছাড়া এসময়কার মসজিদ রয়েছে মানটিনগান ও সেনডাং দুবুরে। এসব মসজিদের গায়ে ষোড়শ শতকের অলংকৃত প্যানেল রয়েছে। প্রাক-মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে বড়ো রকমের বিচ্ছেদ ঘটেনি। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে দেখা যায় রক্ষণশীল চিন্তার পাশাপাশি ছিল অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাভাবনা। উত্তর সুমাত্রার আকেতে রক্ষণশীল গোঁড়া ইসলামের সঙ্গে রয়েছে এই রহস্যময়তা। জাভাতে ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রাক-ইসলাম সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়নি। ক্ল্যাসিকাল ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে বানপ্রস্থ বা অরণ্যবাসের কথা আছে জীবনের তৃতীয় পর্বে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বানপ্রস্থকালে অরণ্যের শান্ত, নির্জন পরিবেশে জীবন, সত্য ও স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ে। বনের আশ্রমে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা শিক্ষা লাভের জন্য আসত। এসব আশ্রম কালক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিত। প্রাচীন জাভাতে ভারতের এই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়। দিয়েং মালভূমি অঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শিষ্যরা শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দিত না, দিত সব রকমের সেবা। শিষ্যরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, মাঠে ও বাগানে তারা কাজ করত। বড়ো বড়ো আশ্রমগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র মণ্ডল নামে পরিচিত হয়, মাজাপাহিতে এদের দেখা যায়, তান্ত্র পাঙ্গেলারানে এদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইসলামের আগমনের পর এসব প্রতিষ্ঠান গুরুর অধীনে শাস্ত্র পাঠের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এরকম একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হল গিরি, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ ছিল। মাতরমের সুলতান আগুঙ্গ এই অঞ্চল জয় করে এই অঞ্চলে পুরোহিত প্রভাবিত রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। এই সময়কালে জোগ-জাকার্তার

পূর্বদিকে কাজোরানে এরকম একটি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এখানে কী ধর্মতত্ত্ব প্রচলিত ছিল ঠিক জানা যায় না। সপ্তদশ শতকের তৃতীয় পাদে কাজোরানের উলেমারা মাতরমের বিদ্রোহী রাজপুত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুলাবেশি ও মাদুরার সৈন্য নিয়ে সুলতান আগুঙ্গের উত্তরাধিকারী প্রথম আমাংকুরাতের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল (১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই রাজা যথেষ্ট গোঁড়া ও রক্ষণশীল ছিলেন না। রাজনৈতিক পালাবদলে ধর্মীয় কারণ কতখানি দায়ী ছিল নির্ধারণ করা যায় না। রাজসভার আচার-আচরণ ইসলাম বিরোধী ছিল বলে বিদ্রোহ এমন তথ্যও পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলি, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মতো, বস্তুগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, জমি ও শ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল, পার্দিকান গ্রামগুলিতে এরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব জাভাতে খুব বেশি ছিল না। তবে রাজবংশ ও কৃষি সমাজের দ্বন্দ্বে ধর্মীয় প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ত।

জাভাতে প্রাক-মুসলিম যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। ইসলাম এসব ঐতিহ্য ও আচারের সঙ্গে আপস করেছিল। ইসলামের আগমনের প্রথম পর্বে বুদ্ধিজীবীরা পুরোনো ও নতুন ধর্মের মধ্যে সাযুজ্য খোঁজেন। মাতরম রাজবংশের একজন পূর্বপুরুষ মন্তব্য করেন যে বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নেই, আকৃতিতে এরা দুই, আসলে এক। এই সমন্বয়ের ধারা জাভার ছায়া নাটকে লক্ষ করা যায় (ওয়েয়াং কুলিট)। এসব নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি। এসব কাহিনিকে জাভার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। চরিত্রগুলি চর্মনির্মিত, সূক্ষ্ম ভাবে তৈরি করা, এরা জীবন্ত কাহিনি উপহার দেয়। পুতুলগুলিকে পরিচালনা করে ফালাং। ইসলামি অনুশাসন অনুসরণ করে এই পুতুলগুলিকে বিশেষ রূপ দেওয়া হয়। ক্লাউনদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, অর্জুনের ভৃত্য সেমার রহস্যচ্ছলে পরম সত্যকে প্রকাশ করে দেয়। এসব নাটকের ওপর ইসলামের প্রভাব খুবই গৌণ, এগুলি ইসলামি উৎসবে গৌরব দান করত। কিছু ধর্মীয় কথা উচ্চারণ করে এসব অনুষ্ঠান শুরু করা হত।

অন্যান্য জাভা অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। সব প্রধান অনুষ্ঠানে ভোজের ব্যবস্থা থাকত। জন্ম, মৃত্যু, হাজাম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এই ভোজ অনুষ্ঠানের নানারূপ দেখা যায়, স্থানীয় মসজিদের একজন কর্মচারী এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হত, অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রার্থনা হত, এই স্লামেতানের (ভোজ) ঐতিহ্যবাহী চরিত্র ছিল। কোনোকিছু ধর্মীয় কাজ শুরুর আগে জাভাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান হত। মূলত এটি ছিল বিশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, পরে এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্য স্থাপনে সহায়ক হয়। জাভার বাইরে ভারতীয় প্রভাব ছিল নগণ্য। সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে কিছু ভারতীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। এসব অঞ্চলে ইসলামের

আগমন ঘটে অনেক দেরিতে। মেলকা ও জাভা থেকে ইসলামের বিস্তার ঘটে, অন্যান্য মুসলিম সংস্কৃতি কেন্দ্র হল গিরি, তুবান ও সুরবায়া। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ অধিকারের সময়ে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল উত্তর জাভার উত্তরাঞ্চলে। পর্তুগিজ ও স্পেনীয় অনুপ্রবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। ব্যতিক্রম হল উত্তর ও মধ্য ফিলিপিনস ও পূর্ব ইন্দোনেশিয়া। এসব অঞ্চলেও ইসলামের প্রভাব পড়েছিল। দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইসলাম ছিল শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক শক্তি।

৪.৬ প্রাক-আধুনিক যুগে বিদেশিদের চোখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ত্রয়োদশ শতকের শেষ নাগাদ মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার আগে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই সময়ে মার্কোপোলো ... সঙ্গীরা চম্পার উপকূল বরাবর এগিয়েছিল। মোঙ্গল নেতা কুবলাই খানের